মাদকাসক্তি ও এইডস

ইউনিট ৬

ভূমিকা

মাদকাসক্তি বলতে মাদকদ্রব্যের প্রতি নেশাকে বোঝায়। যেসব দ্রব্য সেবন করলে আসক্তির সৃষ্টি হয়, জ্ঞান অর্জনের স্পৃহা ও স্মৃতিশক্তি কমে যায় সেগুলো মাদকদ্রব্য। ব্যাপক অর্থে যে দ্রব্য গ্রহণের ফলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক পরিবর্তন ঘটে এবং ঐ দ্রব্যের প্রতি নির্ভরশীলতা সৃষ্টি হয়, পাশাপাশি দ্রব্যটি গ্রহণের পরিমাণ ক্রমশই বাড়তে থাকে এমন দ্রব্যকে মাদকদ্রব্য বলে। ব্যক্তির এই অবস্থাকে বলে মাদকাসক্তি। সিগারেট বিড়ি, তামাক, চুরুট, মদ, তাড়ি, গাঁজা, চরস, ভাং, মারিজুয়ানা, হেরোইন, ফেনসিডিল, মরফিন, ইয়াবা ইত্যাদি মাদকদ্রব্য। এ এক ভয়ংকর নেশা। এ নেশা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া খুবই কঠিন।

আমাদের শরীরের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে। ফলে কোনো রোগজীবাণু শরীরে সহজে ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু এমন কিছু ক্ষতিকর ভাইরাস আছে যা শরীরের রোগ প্রতিরোধকারী ক্ষমতাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিতে পারে। এইচআইভি তেমনি একটি ভাইরাস। এই ভাইরাস রক্ত, বীর্য, যোনিরস, বুকের দুধ, প্রভৃতির মাধ্যমে অন্যের দেহে সংক্রমিত হয়। কোনো মানুষের শরীরে এই ভাইরাস প্রবেশ করলে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে, প্রচলিত চিকিৎসায় সে সুস্থ হয়ে ওঠে না। এইচআইভি ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত ব্যক্তির অবস্থাকে এইডস বলে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ–৬.১ : মাদকদ্রব্য ও মাদকাসক্তি
পাঠ-৬.২ : মাদকাসক্তি থেকে বিরত থাকার উপায়
পাঠ-৬.৩ : এইচআইভি ও এইডস
পাঠ-৬.৪ : বাংলাদেশে এইচআইভি ও এইডস-এর ঝুঁকি ও তার প্রতিরোধ কার্যক্রম
পাঠ-৬.৫ : অটিজম

পাঠ-৬.১ মাদকদ্রব্য ও মাদকাসক্তি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- মাদকাসক্তির কারণ ও লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন;
- মাদকদ্রব্য সেবনের কুফল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মাদকাসক্তি বলতে মাদকদ্রব্যের প্রতি প্রচন্ড আসক্তি বা নেশাকে বোঝায়। যেসব দ্রব্য সেবন বা পান করলে তীব্র নেশার সৃষ্টি হয় সেগুলো মাদকদ্রব্য। কোনো কোনো ঔষধকে ব্যবহারগত কারণে মাদকদ্রব্য বলা হয়। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনো ঔষধ অতিরিক্ত সেবন করলে এবং আসক্তি জন্মালে সেটাও মাদকদ্রব্যের আওতায় পড়ে। বাংলাদেশে প্রচলিত মাদকদ্রব্যগুলোকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়:

১। **আফিম জাতীয় মাদকদ্রব্য:** আফিমজাতীয় মাদকদ্রব্য পপি ফুলের বীজ থেকে অথবা অন্য কোনো কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তত করা হয়। যেমন–

ক) ফেনসিডিল- একসময় কাশির ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হত। এখন এ ঔষধ বাংলাদেশে নিষিদ্ধ।

খ) পেথিডিন- এটি ব্যথা নাশক একটি কৃত্রিম মাদকদ্রব্য। মাদক সেবকরা এটি ইনজেকশনের মাধ্যমে গ্রহণ করে নেশাগ্রস্ত হয়।

গ) আফিম- পপিফুলের বীজ থেকে তৈরি করা হয়। এটি পাউডার আকারে পাওয়া যায়। খাওয়া এবং ধুমপানের মাধ্যমে এটি দিয়ে নেশা করা হয়।

ঘ) হেরোইন- আফিম থেকে তৈরি একটি মাদকদ্রব্য। একসময় ব্যথানাশক হিসেবে ব্যবহার করা হতো। কিন্তু নেশা হিসেবে ব্যবহার করায় বাংলাদেশে একে অবৈধ ঘোষণা করা হয়।

ঙ) মরফিন- মরফিনও আফিম থেকে তেরি হয়। এটি বেদনা নাশক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এটি সলিউশন আকারে পাওয়া যায়। মাদক সেবিরা ইনজেকশনের মাধ্যমে এটি গ্রহণ করে।

২। **গাজা জাতীয়:** এসব মাদকদ্রব্য গাঁজা গাছ থেকে তৈরি হয়। এসব মাদকদ্রব্যের মধ্যে রয়েছে মারিজুয়ানা, হাশিশ ও ভাং।

৩। **ঘুমের ঔষধ:** কোনো কোনো রোগের চিকিৎসার জন্য ঘুমের ঔষধ সেবনের পরামর্শ দেয়া হয়। এই ঘুমের ঔষধকেও মাদকদ্রব্য হিসেবে অপব্যবহার করা হচ্ছে।

৪। **ট্রাংকুইলাইজার:** এগুলো এক ধরনের বড়ি। ঘুমের বড়ির চেয়ে কম শক্তিশালী। চিকিৎসার প্রয়োজনে ডাক্তারগণ এ বড়ি খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এগুলো হচ্ছে রিলাক্সেন, সেডিল, ভ্যালিয়াম। এগুলো দীর্ঘদিন ব্যবহার করা উচিত নয়।

৫। **মদ বা অ্যালকোহল:** এর মধ্যে রয়েছে দেশি, বিদেশি মদ ও ঘরে তৈরি মদ। মদ নেশার অন্যতম উপকরণ। এতে সহজে আসক্ত হওয়া যায়।

৬। **তামাক জাতীয় মাদকদ্রব্য:** তামাক গাছের পাতা প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। তামাকের মধ্যে আছে নিকোটিন, যা মাদকদ্রব্য। আমাদের দেশে বিড়ি, সিগারেট, হুক্কা, চুরুট ইত্যাদির মাধ্যমে নিকোটিন সেবন করে থাকে। নিকোটিন শরীরের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

শিক্ষার্থীর কাজ

ডানদিকের কলামে মাদকদ্রব্যসমূহের উৎস উল্লেখ করুন।	
আফিম জাতীয় মাদকদ্রব্য	
গাঁজা জাতীয় মাদকদ্রব্য	
তামাক জাতীয় মাদকদ্রব্য	

মাদকদ্রব্য সেবনের কুফল

তামাক ও মাদকদ্রব্য সেবন বলতে ধূমপানকে বোঝায়। ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুসারে পৃথিবীতে প্রতি ৮ সেকেন্ডে শুধু ধূমপানজনিত কারণে একজন ব্যক্তির মৃত্যু হচ্ছে।

মাদকদ্রব্য সেবনের কুফলসমূহ–

- আফিমজাতীয় মাদকদ্রব্য সেবনে বিভিন্ন শারীরিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় যেমন- বমি বমি ভাব, ঘাম হওয়া, চুলকানি ও মাথাঘোরা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শ্বাস প্রশ্বাসের অসুবিধা দেখা দেয় এবং মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতাও হ্রাস পায়।
- গাঁজাজাতীয় মাদকদ্রব্য ব্যবহারকারীকে নিস্তেজ করে ফেলে। গাঁজাজাতীয় মাদকদ্রব্য সেবনের ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস সংক্রান্ত সমস্যা, ফুসফুস এবং গলার ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে।
- মাত্রাতিরিক্ত ঘুমের ঔষধ খেলে স্মৃতিশক্তি লোপ পায়, জ্ঞান হারিয়ে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুও হতে পারে। ঘুমের ঔষধ ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া খাওয়া উচিত নয়।
- ট্রাংকুইলাইজারজাতীয় ঔষধ মাত্রাতিরিক্ত বা দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে মাথা ব্যথা, পাকস্থলীর গোলযোগ, চামড়ার ফুসকুড়ি, বমি বমি ভাব ও ঝিমুনির মতো মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হতে পারে।
- মদ বা অ্যালকোহলে আসক্ত হয়ে পড়লে ব্যক্তির ভালো মন্দ বিচারের ক্ষমতা কমে যায়। বেশি পরিমাণ মদ পান করলে অচেতন হয়ে পড়তে পারে। দীর্ঘদিন মদপান করলে পানকারী বিভিন্ন প্রকার অপুষ্টিতে ভোগে এবং লিভার সিরোসিসের মতো মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হতে পারে।
- তামাকের মধ্যে নিকোটিন আছে। এটি শরীরের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এটি রক্তের চাপ বৃদ্ধি করে এবং স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতিসাধন করে। যারা বহুদিন ধরে সিগারেট বা তামাক সেবন করে তাদের ফুসফুস এবং শ্বাসতন্ত্রের ক্ষতি হয়।
- মদ বা এলকোহলে আসক্তি হয়ে পড়লে ব্যক্তির ভালো মন্দ বিচার করার ক্ষমতা লোপ পায়। দীর্ঘদিন মদ পান করলে পানকারী বিভিন্ন প্রকার অপুষ্টিতে ভোগে ও বমি হতে পারে। লিভার সিরোসিসের মত মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

ঔষধ ও মাদকদ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য

- ঔষধ সেবন করলে রোগমুক্তি ঘটে, আর মাদকদ্রব্য সেবন করলে শরীরে রোগ বাসা বাঁধে;
- মাদকদ্রব্য সেবনে মানুষের স্বাভাবিক আচরণে পরিবর্তন হয় ঔষধ সেবনে তা হয় না;
- ঔষধ গ্রহণের মাত্রা নির্ধারিত থাকে, মাদকদ্রব্য গ্রহণের কোনো মাত্রা নেই। মাদকাসক্তরা মাদকদ্রব্য গ্রহণের মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি করতে থাকে।
- অসুখ সেরে গেলে ঔষধ খাবার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু মাদকে আসক্ত হয়ে পড়লে সহজে তা ছাড়া যায় না।

শিক্ষার্থীর কাজ	মাদকদ্রব্যের নামের সাথে ডানদিকে মাদকদ্রব্য সেবনের ফলাফল মিল করে দেখান।	
	১। হাশিশ	• চিন্তাশক্তি হ্রাস পায়, লিভার সিরোসিস হতে পারে।
	২। হোরোইন	• মাংসপেশির শৈথিল্য দেখা দেয়
	৩। আফিম	• স্মৃতিশক্তি লোপ পায়, জ্ঞান হারিয়ে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুও হতে পারে
	৪। ঘুমের ঔষধ	• ফুসফুস এবং গলায় ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে
	৫। অ্যালকোহল	• ক্ষুধা, রক্তচাপ এবং শ্বাস প্রশ্বাসের হার দ্রুত কমিয়ে দেয়।

সারাংশ

মাদকাসক্তি হলো ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর এমন একটি মানসিক ও শারীরিক প্রতিক্রিয়া যা জীবিত ব্যক্তি ও তার সেবনকৃত মাদকের পারস্পরিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়। যে দ্রব্য গ্রহণ করলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক পরিবর্তন ঘটে, ঐ দ্রব্যের প্রতি নির্ভরশীলতা সৃষ্টির পাশাপাশি দ্রব্যটি গ্রহণে প্রচন্ড আকাঙ্খা ক্রমশই বৃদ্ধি পায়, এমন দ্রব্যকে মাদকদ্রব্য বলে। ব্যক্তির এই অবস্থাকে বলে মাদকাসক্তি। আফিম, গাঁজা, ঘুমের ঔষধ, তামাকজাতীয় দ্রব্যাদিই হলো মাদকদ্রব্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মাদকাসক্তি কী?

ক) মাদকদ্রব্যের প্রতি আসক্তি খ) মাদক সেবনের শক্তি

গ) মানসিক শক্তি ঘ) শারীরিক শক্তি

২। নিকোটিন কোন জাতীয় মাদকদ্রব্যে থাকে?

ক) হেরোইন খ) চড়স

গ) গাঁজা ঘ) তামাক

৩। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুসারে পৃথিবীতে প্রতি কত সেকেন্ডে ধূমপানজনিত কারণে একজন ব্যক্তির মৃত্যু হয়?

ক) ১০ সেকেন্ডে খ) ৮ সেকেন্ডে

গ) ৯ সেকেন্ডে ঘ) ১১ সেকেন্ডে

৪। দীর্ঘদিন মদপান করলে কী রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে?

i. শ্বাস কষ্ট

ii. স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতিসাধন

iii. লিভার সিরোসিস

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) iii ঘ) i ও ii

পাঠ-৬.২ মাদকাসক্তি থেকে বিরত থাকার উপায়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ধূমপান ও মাদক থেকে বিরত থাকার কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন;
- ধূমপান ও মাদকসেবন থেকে বিরত থাকার বিষয়ে সমাজের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

ধূমপান ও মাদকাসক্তি থেকে বিরত থাকার উপায়

ধূমপান ও মাদকদ্রব্য সেবনের কুফল সম্পর্কে পূর্ববর্তী পাঠে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু সুস্থ ও প্রাণময় জীবনযাপনের জন্য এই জানা যথেষ্ট নয়। এ জন্য দরকার কখনো কোনো অবস্থাতেই ধূমপানসহ অন্য কোনোভাবে মাদক সেবন না করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া।

কিশোর কিশোরীরা কৌতূহল বা উত্তেজনার বশে কিংবা কারও দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এমন কিছু করতে পারে, যা পরবর্তী জীবনের জন্য অনুশোচনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্য কৌতূহলবশত বা উত্তেজনা বা হতাশা দেখা দিলেও প্রথমেই ভাবতে হবে কোনো কাজ করলে তার ফলাফল কী হতে পারে। ধূমপান ও মাদকদ্রব্য সেবনের কুফলগুলোর প্রত্যেকটি বিবেচনা করলে মাদক হতে দূরে থাকা সহজ হবে। এজন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে–

১। ধূমপান ও মাদক সেবনের ফলে প্রথমে কী অবস্থা হয়, তা মনে মনে ভাবতে হবে।

২। ধূমপান বা মাদক সেবন করলে স্নেহময় মা-বাবা, প্রিয় ভাই বোনদের মানসিক ও সামাজিক অবস্থা কী হবে তা ভাবতে হবে।

৩। ধূমপান বা মাদক সেবন না করার বিষয়ে প্রথমেই দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে পারলে এ সর্বনাশা কাজ থেকে বিরত থাকা যায়।

৪। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রথমে পরিস্থিতি, সমস্যা, বিপদ চিহ্নিত করে এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এ তথ্য ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক কিংবা অন্য কোনো সূত্র থেকে সংগ্রহ করতে হবে। তথ্যের প্রেক্ষিতে করণীয় সমাধান চিহ্নিত করে তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হতে হবে।

৫। ধূমপান ও মাদকসেবন থেকে শুধু নিজে বিরত থাকলে চলবে না, বন্ধু-বান্ধব, সহপাঠী, পরিচিত জনকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে হবে তারা যেন এই মারাত্মক নেশা থেকে দূরে থাকে।

৬। মাদকদ্রব্য সেবনের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর দিক জেনে সবার উচিত এ থেকে নিজে মুক্ত থাকা, বন্ধু-বান্ধব, ও অন্যদেরকে মাদকদ্রব্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করা।

মাদকমুক্ত থাকার ক্ষেত্রে অন্যদের ভূমিকা

মাদকাসক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বন্ধু বান্ধবদের ক্ষতিকর প্রভাব বেশ বড় ভূমিকা পালন করে। তবে সব বন্ধুই কি মাদকাসক্ত, নিশ্চয়ই, না। দু'একজন হয়ত দু'র্ভাগ্যক্রমে মাদকাসক্ত হয়। তবে বেশিরভাগ বন্ধুই ভালো হয়। এ ভালো বন্ধুরাই অন্য বন্ধুদেরকে মাদক গ্রহণ না করার জন্য প্রভাবিত করতে পারে। মাদকমুক্ত থাকার ক্ষেত্রে সহপাঠী বা সমবয়সি ছাড়াও আরও অনেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন– সন্তানের প্রতি অভিভাবকের সতর্ক দৃষ্টি সবচেয়ে বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখে। এছাড়া বিদ্যালয়ের শিক্ষকের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ, ছাত্রদের কাছে শিক্ষক আদর্শস্বরূপ। শিক্ষকের আদেশ উপদেশ ছাত্ররা আন্তরিকভাবে পালন করে। আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশীরাও স্নেহ, ভালোবাসা ও আন্তরিকতা দিয়ে ছেলেমেয়েদেরকে মাদকমুক্ত থাকতে সাহায্য করতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম যেমন- পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশনে, মাদকবিরোধী প্রচারণা চালিয়ে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে। এর বাইরে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেও মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	মাদকদ্রব্য গ্রহণের ৪টি কুফল লিখবেন, যা ভাবলে আপনি কখনও মাদকদ্রব্য গ্রহণ করবেন না। ১। ২। ৩। ৪।

সারাংশ

মানুষের জন্য ক্ষতিকর মাদকাসক্তির মতো মারাত্মক অভ্যাসটি যাতে ত্যাগ করা যায় সেজন্য বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য প্রথমেই দরকার ধূমপানসহ কোনো মাদকদ্রব্য গ্রহণ না করার প্রতিজ্ঞা করা। মাদক সেবন ও ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হলে মনে মনে চিন্তা করতে হবে– মাদক সেবন করলে কী অবস্থা হবে, মা-বাবা অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়বেন, তাহলে মাদক সেবন থেকে বিরত থাকা সম্ভব হবে। মাদকদ্রব্যের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে, বন্ধুবান্ধব সকলকে এর কুফল সম্পর্কে বোঝাতে হবে তাহলে কেবল মাদক গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখা সম্ভব হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ধূমপান ও মাদক গ্রহণের ফলে প্রথমে কী অবস্থা হয় তা নিয়ে–

ক) আলোচনা করতে হবে খ) মনে মনে ভাববে

গ) তা চিন্তা করবে না ঘ) মনে করবে না

২। কিশোর কিশোরীরা কীভাবে মাদকের সাথে জড়িয়ে পড়ে?

i. কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে

ii. এমনি এমনি

iii. কৌতূহলবশত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। কীভাবে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হয়?

i. রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে

ii. পত্র পত্রিকার মাধ্যমে

iii. রাস্তায় ঘুরেঘুরে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। মাদক গ্রহণ করলে আত্মীয় স্বজন ও পাড়াপ্রতিবেশীদের নিকট কেমন আচরণ পাওয়া যায়?

ক) স্নেহ পাওয়া যায় খ) সবাই ভালোবাসে

গ) সবাই ডাকে ঘ) স্নেহ ও ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়

পাঠ-৬.৩ এইচআইভি ও এইডস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- HIV-AIDS কী তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- HIV-AIDS-এর বিস্তার ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- HIV-AIDS-এর বিস্তার প্রতিরোধে করণীয় বলতে পারবেন।

এইচআইভি (HIV)

আমাদের প্রত্যেকের শরীরে নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে। এই প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকার কারণে কোনো রোগের জীবাণু প্রবেশ করলে সহজে শরীরের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। এমন কিছু ভাইরাস আছে যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে আস্তে আস্তে দুর্বল করে। এক সময় তা সম্পূর্ণভাবেই নিঃশেষ করে ফেলতে পারে। এইচআইভি এমনই একটি ভাইরাস।

এইচআইভি মানুষের শরীরে উৎপন্ন তরল পদার্থ যেমন রক্ত, বীর্য, যোনিরস, ও বুকের দুধ ইত্যাদিতে থাকে। এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির এই তরল পদার্থগুলো (রক্ত, বীর্য, যোনিরস) বিভিন্নভাবে সুস্থ লোকের শরীরে প্রবেশ করলে এবং সংক্রমিত মায়ের দুধ সুস্থ শিশু পান করলে তার শরীরেও এইচআইভি-র সংক্রমণ ঘটবে।

HIV-এর পূর্ণ রূপঃ

H = Human (মানুষ)

I = Immuno-deficiency (রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস)

V = Virus (জীবাণু)

HIV -কে সম্প্রসারণ করলে দাঁড়ায় Human Immuno deficiency virus যার বাংলা অর্থ মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাসকারী জীবাণু। এই ভাইরাস কোনো ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করলে পরিণামে তার এইডস হয়।

এইডস (AIDS)

এইডস কোন রোগ নয়, এটি একটি অবস্থা। এর নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা বা প্রতিষেধক ওষুধের আবিষ্কার আজও হয়নি। তাই কোনো ব্যক্তির এইডস হলে মৃত্যু তার একমাত্র পরিণতি।

HIV কোনো মানুষের শরীরে প্রবেশ করলে রক্তের শ্বেত কণিকা ধ্বংস করার মাধ্যমে ধীরে ধীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। তখন সে ব্যক্তি নানা ধরনের রোগে (যেমন- ডায়রিয়া, যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া ইত্যাদি) ঘন ঘন আক্রান্ত হয়। এইচআইভি সংক্রমিত কোনো ব্যক্তির এরূপ অবস্থাকে এইডস বলে। AIDS-এর পূর্ণরূপ Acquired Immune dificiency Syndrome যার অর্থ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাসমূলক অর্জিত অবস্থা।

A = Acquired (অর্জিত)

I = Immune (রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা)

D = Deficiency (হ্রাস)

S = Syndrome (লক্ষণসমূহ)

এইচআইভি কোনো ব্যক্তির শরীরে প্রবেশের সাথে সাথে কোনো লক্ষণ দেখা দেয় না। এইডস-এ আক্রান্ত ব্যক্তির লক্ষণ প্রকাশ পেতে বেশ কিছুদিন সময় লাগে। HIV সংক্রমণের শুরু থেকে এইডস হওয়ার সময় ৬ মাস থেকে কয়েক বছর হতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৫ বছর থেকে ১০ বছর বা তারও বেশি সময় লেগে যেতে পারে। এই সময়কালকে সুপ্তাবস্থা বলে। এই সময়ের মধ্যে HIV আক্রান্ত ব্যক্তির দ্বারা সুস্থ ব্যক্তির শরীরে এইডস সংক্রমিত হতে পারে।

এইডস-এর লক্ষণসমূহ

এইডস-এর নির্দিষ্ট কোনো লক্ষণ নাই। তবে এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি অন্য রোগে আক্রান্ত হয়। সে লক্ষণগুলো হলো–

১। এক মাসের বেশি সময় টানা কাশি

২। সারা দেহে চুলকানি জনিত চর্মরোগ

৩। মুখ ও গলায় ফেনাযুক্ত এক ধরনের ঘা

৪। লসিকাগ্রন্থি ফুলে যাওয়া

৫। স্মরণ শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা কমে যাওয়া

এ ছাড়াও এইডস-এর প্রধান লক্ষণগুলো হলো–

১। অতি দ্রুত ওজন হ্রাস পাওয়া

২। রাতে জ্বর আসা

৩। শরীরে অতিরিক্ত ঘাম হওয়া

৪। অবসাদগ্রস্থ থাকা

৫। দু'মাসের অধিক সময় ধরে ডায়রিয়া

৬। দীর্ঘদিন ধরে শুকনো কাশি

উল্লেখ্য যে, কারোর মধ্যে উপরের একাধিক লক্ষণ দেখা দিলেই তার এইডস হয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়া যাবে না। অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে HIV সংক্রমণের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

এইচআইভি এবং এইডস-এর বিস্তার

এইচআইভি একটি নীরব ঘাতক। এই নীরব ঘাতকের বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়ার আগে এইচআইভি ও এইডস কীভাবে বিস্তার লাভ করে তা জানবার জন্য প্রথমেই জানা প্রয়োজন এই ভাইরাস কীসে থাকে। মানুষের শরীরে উৎপন্ন বিভিন্ন তরল পদার্থ যেমন- রক্ত, বীর্য, যৌনিরস, লালা এগুলোতে HIV বাস করে। এ গুলোর মধ্যে মুখের লালায় HIV -র পরিমাণ কম থাকে বলে লালা ঝুঁকিপূর্ণ নয়। কিন্তু রক্ত, যোনিরস ও বীর্য কোনোভাবে আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে সুস্থ ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করলে এইচআইভি সংক্রমণ ঘটে। বিভিন্ন উপায়ে এইচআইভি ছড়াতে পারে। যেমন–

১। অনিরাপদ দৈহিক সম্পর্ক

এইচআইভি ছড়ানোর সবচেয়ে বড় কারণ অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে সারা বিশ্বের এইচআইভি ব্যক্তিদের শতকরা আশি (৮০%) ভাগই অনিরাপদ দৈহিক মিলনে হয়েছে। আক্রান্ত ব্যক্তির বীর্য বা যোনিরসের মাধ্যমে যৌন সঙ্গীর দেহে এইডস-এর ভাইরাস প্রবেশ করে। আরও বিপদজনক হলো যৌনসঙ্গিনী যদি সন্তান ধারণ করে তবে ঐ সন্তানের দেহেও এইচআইভি প্রবেশ করে।

২। আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তগ্রহণ

অনেক সময় বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হলে বা অপারেশনের সময় বা দুর্ঘটনায় পড়লে অন্যের রক্ত নিতে হয়। তাছাড়াও বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার জন্য একজনের শরীরের অঙ্গ যেমন- কর্নিয়া, হৃৎপিন্ড, কিডনী বা অন্য কোনো অঙ্গ এক ব্যক্তির দেহ থেকে অন্য ব্যক্তির দেহে প্রতিস্থাপন করা হয়। অসচেতনতা বা দায়িত্বহীনতার কারণে অনেক সময় অপারেশনের যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করা হয় না। এইচআইভি সংক্রমিত রক্ত বা এইচআইভি আক্রান্ত কোনো ব্যক্তির অঙ্গ অন্য কোনো ব্যক্তির দেহে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে এইচআইভি বিস্তার লাভ করে।

মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা প্রায়ই এক সুচ ও সিরিঞ্জ ব্যবহার করে। এতে সুস্থ ব্যক্তির দেহে এইচআইভি ভাইরাসের সংক্রমণ হয়। এইচআইভি বা এইডস আক্রান্ত মায়ের নিকট থেকে তিনটি পর্যায়ে শিশুর শরীরে এর ভাইরাস সংক্রমিত হতে পারে। যেমন-

ক) গর্ভকালীন সময়ে

খ) প্রসবকালীন সময়ে

গ) মায়ের দুধ পানের মাধ্যমে।

এখন জানতে হবে HIV ভাইরাস কীভাবে ছড়ায় না–

- মশা বা পোকা মাকড়ের কামড়ের মাধ্যমে এইডস ছড়ায় না।
- এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে ওঠাবসা করলে এইডস ছড়ায় না।
- এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির সেবা করলে এইডস ছড়ায় না।
- এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে করমর্দন বা কোলাকুলি করলে এইডস ছড়ায় না।
- এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত গোসলখানায় বা পুকুরে গোসল করলে এইডস ছড়ায় না।
- এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত বিছানাপত্র, বাসনকোসন ব্যবহার করলে এইডস ছড়ায় না।
- এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে লেখাপড়া বা খেলাধুলা করলে এইডস ছড়ায় না।
- এইচআইভ ব্যক্তির হাঁচি বা কাশির মাধ্যমে এইডস ছড়ায় না।

শিক্ষার্থীর কাজ

HIV কীভাবে ছড়ায় এ বিষয়ে নিচে কিছু বিবৃতি দেয়া হলো। প্রতি বিবৃতির বিপরীতে সত্য হলে ‘স’ মিথ্যা হলে ‘মি’ লিখুন।

বিবৃতি	স/মি	বিবৃতি	স/মি
১. এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির সেবা করলে		৭. আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে একই বিছানায় শয়ন করলে	
২. আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে একই থালায় খাবার খেলে		৮. এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত গোসলখানা, পুকুরে গোসল করলে	
৩. আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত নিজ শরীরে গ্রহণ করালে		৯. ইনজেকশনের জন্য আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত সুচ ও সিরিঞ্জ ব্যবহার করলে	
৪. সুস্থ ব্যক্তির শরীরে জীবাণুমুক্ত রক্ত প্রবেশ করালে		১০. আক্রান্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করলে	
৫. মশার কামড়ের মাধ্যমে		১১. আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি/কাশির মাধ্যমে	
৬. আক্রান্ত মায়ের দুধ পান করলে		১২. আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে দৈহিক মিলন ঘটলে	

সারাংশ

বিশ্বে যে কয়েকটি ঘাতক ব্যাধি আছে তার মধ্যে এইডস অন্যতম। বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক বা নিরাময় ব্যবস্থা থাকলেও এইডস সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করতে পারে এমন ঔষধ এখনো আবিষ্কার হয়নি। প্রত্যেক মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে। ফলে কোনো রোগের জীবাণু সহজে শরীরের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু এমন কিছু ভাইরাস আছে যা শরীরকে ধীরে ধীরে দুর্বল করে ফেলে। এমনই একটি ভাইরাসের নাম HIV। এইচআইভি একটি ক্ষুদ্র বিশেষ ধরনের ভাইরাস যা কোনো মানুষের শরীরে নির্দিষ্ট কয়েকটি উপায়ে প্রবেশ করে রক্তের শ্বেতকনিকা ধ্বংসের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। তখন সে বিভিন্ন ধরনের রোগ ডায়রিয়া নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতিতে ঘন ঘন আক্রান্ত হয়। এইচআইভি সংক্রমিত কোনো ব্যক্তির এরূপ অবস্থাকে এইডস (AIDS) বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। এইচআইভি কী?

ক) ওষুধ
খ) একটি ভাইরাস
গ) রোগের নাম
ঘ) একটি রক্তের নাম

২। এইডস হতে পারে কখন?

ক) আক্রান্ত মায়ের দুধ পান করলে
খ) রোগীর সেবা করলে
গ) একই বিছানা ব্যবহার করলে
ঘ) একসাথে গোসল করলে

৩। এইডস কী?

ক) কোনো রোগ নয়
খ) এটি একটি টিকার নাম
গ) এটি রোগাক্রান্ত শারীরিক অবস্থা
ঘ) একটি ভাইরাসের নাম

৪। এইডসের লক্ষণ হচ্ছে–

i. ওজন হ্রাস পাওয়া
ii. রাতে জ্বর আসা
iii. দীর্ঘদিন ধরে শুকনো কাশি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i, ii
খ) i
গ) i, ii, iii
ঘ) i ও iii

পাঠ-৬.৪ বাংলাদেশে এইচআইভি ও এইডস এর ঝুঁকি ও তা প্রতিরোধের উপায়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- HIV-AIDS থেকে ঝুঁকিমুক্ত থাকার উপায় বর্ণনা করতে পারবেন;
- HIV-AIDS-এর ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতার পদ্ধতি বলতে পারবেন;
- HIV-AIDS প্রতিরোধে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সেবাদানের ধরন বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশে এইচআইভি ও এইডসের ঝুঁকি

এইডস একটি আর্থসামাজিক জনস্বাস্থ্য সমস্যা। বাংলাদেশেও এইডসের বিস্তার ঘটেছে। তবে সাধারণ জনগণের মধ্যে এইডস এখনও মারাত্মক আকার ধারণ করেনি। উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির কারণে অচিরেই আমাদের দেশেও এইডস মারাত্মক রূপ নিতে পারে। এ রোগের পরিণতি মৃত্যু। তাই সকলকে বিশেষ করে অল্প বয়সী মেয়েদেরকে এ বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন হতে হবে এবং সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বাংলাদেশে কিশোরদের চেয়ে কিশোরীরাই বেশি ঝুঁকির মধ্যে আছে। এর প্রধান কারণসমূহ হচ্ছে-

১। আর্থসামাজিক কাঠামোতে মেয়েদের দুর্বল অবস্থান
২। HIV ও AIDS সমন্ধে মেয়েরা কম অবহিত।
৩। নারী পুরুষ বৈষম্যের কারণে পুরুষ দ্বারা মেয়েদের নিগৃহীত হওয়া
৪। মেয়েদের অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক স্থাপনে বাধাদানের ক্ষমতার অভাব
৫। মেয়েদের বিশেষ শারীরিক বৈশিষ্ট্য
৬। অনিরাপদ দৈহিক সম্পর্ক

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ হচ্ছে ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সী কিশোর কিশোরী। বয়ঃসন্ধিকালে তাদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের ফলে তাদের চিন্তা ও আচরণে কৌতূহল জন্মে। বড়দের সাথে তারা এ বিষয়ে আলোচনা করতে পারে না। তাই তারা অনেক আবেগপ্রবণ থাকে এবং অনিরাপদ দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ফলে এ অবস্থায় তারা এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকিতে পড়ে যায়।

এইচআইভি এবং এইডস থেকে ঝুঁকিমুক্ত থাকার উপায়

১। **ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ:** ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ পরিহার করতে হবে।
২। **আবেগ প্রশমন:** প্রধানত কৌতূহল ও আবেগের বশবর্তী হয়েই কিশোর-কিশোরীরা ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ করে। এজন্য কিশোর কিশোরীদের কৌতূহল বা আবেগ প্রশমনের দক্ষতা অর্জন করা অত্যন্ত জরুরী। বাবা-মায়ের সাথে সব বিষয়ে খোলামেলা কথা বলতে পারলে এ কৌতূহল দূর ও আবেগ প্রশমিত হয়।
৩। **ঝুঁকিপূর্ণ প্রস্তাব প্রত্যাখান:** ঝুঁকিপূর্ণ প্রস্তাব বা অনৈতিক প্রস্তাবে 'না' বলার দক্ষতা ও কৌশল অবলম্বন করতে হবে।
৪। **ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন ও রীতিনীতি মেনে চলা:** নেশা করা বা মাদকাসক্ত হওয়া, অনৈতিক দৈহিক বা যৌন সম্পর্ক ইত্যাদি কোনো ধর্ম বা সমাজ অনুমোদন করে না। তাই ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললে এইডসে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা অনেক কমে যায়।
৫। **এইচআইভি এবং এইডস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি:** এইচআইভি এবং এইডস এর ভয়াবহতা সম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার, পোস্টার প্রদর্শন, ব্যানার, ফেস্টুন তৈরি, র‌্যালির আয়োজন, ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করা যেতে পারে। বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির ধারক বয়াতীর পালাগান, পথনাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণকে সহজে উদ্বুদ্ধ করা যায়। এসব কার্যক্রম ব্যক্তির আত্মসচেতনতা সৃষ্টি এবং জনগণের মধ্যে গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এইচআইভি এইডস প্রতিরোধে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে এইডস সংক্রমণ বহুল আলোচিত বিষয়। এইডস এতই মারাত্মক যে, মানুষের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল কমিয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। ২০১০ সালের প্রাপ্ত সরকারি তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তির সম্ভাব্য সংখ্যা প্রায় ৭৫০০, এইচআইভি সংক্রমিত চিহ্নিত ব্যক্তির সংখ্যা ২০৮৮, এইডস-এ আক্রান্তের সংখ্যা ৮৫০ এবং মৃত্যুবরণকারীর সংখ্যা-২৫১ জন। বর্তমানে বাংলাদেশে এইচআইভি সংক্রমণের হার কম হলেও আগামীতে এ হার এরকমই থাকবে তার নিশ্চয়তা নেই।

এইচআইভি আক্রান্তদের সহায়তাদানের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলোতে HIV সংক্রমিত রোগীদের রক্ত পরীক্ষা, পরামর্শদান এবং কিছুটা চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 'আশার আলো সোসাইটি' জাগরণী মেডিকেল ক্লিনিক, মুক্ত আকাশ বাংলাদেশ, হাসাব (HASAB) প্রভৃতি এইচআইভি এবং এইডস আক্রান্তদের সেবাদানের বিষয়ে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সেবাদানমূলক কার্যক্রমের মধ্যে-

১। কাউন্সেলিং বা পরামর্শদান এবং

২। পুর্নবাসন উল্লেখযোগ্য

শিক্ষার্থীর কাজ	এইচআইভি সংক্রমণের ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ আচরণসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।	১। ২। ৩। ৪।
	গণসচেতনতা সৃষ্টিতে কোন কৌশল বেশি উপযোগী বর্ণনা করুন।	১। ২।

১। কাউন্সেলিং

এইচআইভি এবং এইডস-এর কোনো প্রতিষেধক টিকা বা ঔষধ এখনো আবিষ্কার হয়নি। তবে মানসিক সমর্থন ও শক্তি সঠিক চিকিৎসা ও সেবাযত্ন পেলে এইচআইভি এবং এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি দীর্ঘ দিন সুস্থ ও সবল থাকতে পারে। তাই তাদের পরামর্শদান বা কাউন্সেলিং অত্যন্ত প্রয়োজন। বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অভিজ্ঞ পরামর্শক নিয়ে এইডস আক্রান্তদের বাড়িতে গিয়ে নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। তাদেরকে বিভিন্ন সেবাদানসহ চিকিৎসা সুবিধাও দিয়ে থাকে।

রোগ উপশমের পরামর্শ দেয়ার কৌশল: কোনো ব্যক্তির রক্তে এইচআইভি আছে কিনা তা রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায়। রক্ত পরীক্ষার আগে ও পরে কাউন্সেলিং করা হয়। এই কাউন্সেলিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এইডস একটি মরণব্যাধি এর কোনো চিকিৎসা নেই। তবে সেবা যত্ন, উপযুক্ত খাদ্য সহমর্মিতা ও সাহস পেলে এইডস আক্রান্তরাও দীর্ঘজীবন লাভ করতে পারে। পরামর্শ দেয়ার ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো অনুসরণ করা যেতে পারে–

ক) **রক্ত পরীক্ষার পর পরামর্শ:** রক্ত পরীক্ষার পর কোনো ব্যক্তির এইচআইভি ধরা পড়লে সে প্রথমেই ঘাবড়ে যায় ও মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে। তাই ঐ সময় কাউন্সেলিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে তাকে স্বাভাবিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও ঘুমের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সময়ে সময়ে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করে মনোবল অটুট রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

খ) **অন্যান্য রোগ থেকে সতর্ক থাকা:** এইচআইভিতে আক্রান্ত হলে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। তখন ডায়রিয়া, যক্ষ্মা, মুখে ঘা, নানা প্রকার চর্মরোগ, নিউমোনিয়া, প্রচন্ড জ্বর ইত্যাদি আক্রমণ করে। তখন অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিতে হবে।

গ) **ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা গ্রহণ করা:** এইডস থেকে সেরে ওঠার কোনো চিকিৎসা এখনও বের হয়নি তবে এন্টিরেট্রো ভাইরাল ঔষধের মাধ্যমে অনেকটা সুস্থ থাকা যায়, জীবন দীর্ঘায়িত করা যায় তবে এ ওষধ খুবই ব্যয়বহুল।

২। পুনর্বাসন

অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এইডস আক্রান্তদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ দেয়। তাছাড়া তাদের পুনর্বাসনের জন্য বিশেষ ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শনের জন্য এইডস বিরোধী সচেতনতামূলক ফেস্টুন ও পোস্টার তৈরি করুন।

সারাংশ

এইডস একটি আর্থ সামাজিক জনস্বাস্থ্য সমস্যা। বাংলাদেশেও সতর্কতা অবলম্বন না করলে মারাত্মক রূপ ধারণ করতে পারে। বাংলাদেশে কম হলেও এর বিস্তার ঘটেছে। যেহেতু এ রোগ প্রতিকারবিহীন, মৃত্যু অবধারিত তাই অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদেরকে বিশেষভাবে সচেতন হতে হবে। বাংলাদেশে কিশোরীরাই বেশি ঝুঁকির মধ্যে আছে। কারণ মেয়েদের অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক স্থাপনে বাধা দেয়ার ক্ষমতা কম। এইডস থেকে ঝুঁকিমুক্ত থাকার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ পরিহার করতে হবে। আবেগ প্রশমণের দক্ষতা অর্জন করতে হবে। কৌতূহলবশত কিছু করা যাবে না। ঝুঁকিপূর্ণ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সামাজিক রীতিনীতি মেনে চলতে হবে। তাহলে নিজেকে এইডসের ঝুঁকি থেকে দূরে রাখা যাবে। জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারলে সমাজও ঝুঁকিমুক্ত থাকবে। যারাই এইডস-এ আক্রান্ত হবে তাদেরকে কাউন্সেলিং এবং প্রয়োজন হলে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশে জনগণের মধ্যে কারা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ?
ক) বয়স্ক লোকেরা খ) কিশোর-কিশোরীরা
গ) শিশুরা ঘ) বয়স্ক মহিলারা

২। এইডসের ভয়াবহতা সম্পর্কে কীভাবে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে?
ক) অনুশাসন মেনে চলা খ) পাঠ্যবইতে অন্তর্ভুক্ত করে
গ) গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে ঘ) বই-পুস্তক পড়ে

পাঠ-৬.৫ অটিজম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- অটিজম সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন;
- অটিজমের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

অটিজম (Autism)

আমরা প্রতিদিন বিভিন্ন সমস্যার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করি। সুখ-দুঃখ হাসিকান্না আমাদের প্রতি নিয়তের ঘটনা। একটি পরিবারে যখন একটি শিশু জন্মগ্রহণ করে তখন ঐ পরিবারে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। শিশুর সুন্দর ভবিষ্যত গড়ে তোলার জন্য মা-বাবা বিভিন্ন পরিকল্পনা করতে থাকে। এই পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো শিশুর সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশ। শিশুদের শারীরিক মনোসামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ একটি নির্দিষ্ট নিয়মে ঘটলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হতে পারে। যখন কোনো বাবা-মা বুঝতে পারে যে, তার শিশুটি অন্যান্য সাধারণ শিশুদের থেকে ভিন্ন আচরণ করছে অথবা বিকাশের ক্ষেত্রে বয়সের তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়েছে, তখন তাদের মাঝে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে পরিবারটিতে নেমে আসে হতাশা। আবার সেই সাথে শিশুটির প্রতি সমাজের ও পরিবারের সদস্যদের বিরূপ/নেতিবাচক মনোভাবের কারণে মা-বাবাকে প্রতিনিয়তই অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়।

জন্মের পর শিশুর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে বয়স অনুযায়ী দক্ষতা অর্জন করাকেই শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ বলা হয়। আর বিকাশজনিত সমস্যা হলো এমন এক ধরনের দীর্ঘস্থায়ী অবস্থা যা শিশুর মস্তিষ্ক বিকাশের সময় ঘটে থাকে এবং শিশুর শরীরের যে কোনো অংশ অথবা সম্পূর্ণ শারীরিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। শিশুদের নানা ধরনের বিকাশজনিত সমস্যা পরিলক্ষিত হয়, অটিজম হলো সেগুলোর মধ্যে অন্যতম।

অটিজম কী?

অটিজম কোন রোগ নয়। এটি স্নায়ু বিকাশজনিত একটি বিস্তৃতরূপ- যা অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার নামে পরিচিত। এখানে 'স্নায়ু' শব্দটি স্নায়ুতন্ত্র বা মস্তিষ্কের সাথে স্নায়ুর সম্পর্ক বোঝায়। বিকাশজনিত শব্দটির মাধ্যমে শিশুর বিকাশ প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়েছে।

প্রাক-শৈশব কাল থেকে এই সমস্যাটি শুরু হয় যা শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। সাধারণত শিশুর জন্মের দেড় বছর থেকে তিন বছরের মধ্যে অটিজমের লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়। সামাজিক সম্পর্ক, যোগাযোগ এবং আচরণের ভিন্নতাই এই সমস্যাটির প্রধান বিষয়। এছাড়াও অটিজমে শিশুর শারীরিক ও বুদ্ধিভিত্তিক, শিক্ষণ প্রক্রিয়া ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি সংক্রান্ত সমস্যাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সব অটিস্টিক শিশুই একরকম নয় যেমন– অটিজমের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা সব অটিস্টিক শিশুর মধ্যে কমবেশি লক্ষ্য করা যায়। আবার কিছু বৈশিষ্ট্য প্রতিটি শিশুর জন্য আলাদা আলাদা হয়ে থাকে।

অটিজম স্পেকট্রামে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অটিজম লক্ষ্য করা যায়। অটিজম স্পেকট্রামকে একটি রংধনুর সাথে তুলনা করা যায়। রংধনুতে যেমন অনেক রং থাকে অটিজম স্পেকট্রামেও তেমনি বিভিন্ন ধরনের অটিজম থাকে। এগুলোর মধ্যে একটি হলো অ্যাসপার্জার্স সিনড্রোম।

অ্যাসপার্জার্স সিনড্রোম

এটিও এক ধরনের অটিজম যা অটিজম স্পেকট্রামে দেখা যায়। শিশুদের আচরণগত সমস্যা থাকলেও বুদ্ধিভিত্তিক ও ভাষাগত বিকাশে কোনো সমস্যা থাকে না। তবে ভাষার বিকাশ স্বাভাবিক এবং শব্দভাণ্ডার পর্যাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক আলাপচারিতায় অংশ নিতে এদের সমস্যা হয়। এরা একই ধরনের আচরণ পুনরাবৃত্তি করে থাকে। বিশেষত অন্যের সাথে যোগাযোগের সূক্ষ্ম বিষয়গুলো যেমন- চোখে চোখ রেখে তাকানো, অন্যের মৌখিক অভিব্যক্তি, ইশারা, ইঙ্গিত, শারীরিক অঙ্গভঙ্গি এবং আবেগের বহিঃপ্রকাশ তারা বুঝতে পারে না। এরা কথার আক্ষরিক ব্যাখ্যা করে, ফলে বাগধারা, প্রবাদ,

রসিকতা বা ব্যঙ্গ বুঝতে পারে না। এমন শিশুদের বিকাশ বিলম্বিত হয় না, শিক্ষাক্ষেত্রেও এরা এগিয়ে থাকে, এমন কি বুদ্ধিমত্তাও থাকে সাধারণের চেয়ে বেশি। অটিজমের তুলনায় অনেক দেরিতে এমনকি বয়ঃসন্ধিকালে বা পূর্ণবয়স্ক সময়ে তাদের সমস্যাটি শনাক্ত হয়। মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের মধ্যে অ্যাসপার্জার্সের হার দশগুণ বেশি।

এরা যে কোনো বিষয় সঠিক ও সাবলীলভাবে পড়তে শেখে তবে বিষয়টির প্রাসঙ্গিকতা বুঝতে পারে না। সাধারণত অ্যাসপার্জার্স শিক্ষার্থীদের শব্দভান্ডার অনেক বেশি। এরা খুব সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলতে পারে ও অনেক সময় তাদের পছন্দের বিষয়ের উপর দীর্ঘ আলোচনাও করতে পারে। তবে সেসময় সে খেয়াল করে না যে আশেপাশের লোকজন তার বিষয়টিতে আগ্রহী কিনা।

ইন্দ্রিয়ানুভূতি প্রক্রিয়ার সমস্যার এবং শারীরিক নড়াচড়ার অসুবিধা হবার পাশাপাশি তাদের কোনো বিষয়ের প্রতি মনোযোগ কম থাকে, সময়জ্ঞান কমে যায় এবং মাংসপেশিও শিথিল থাকে, ফলে খেলাধুলার মাধ্যমেও সামাজিক যোগাযোগ রক্ষা করা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে।

সাংগঠনিক ক্ষমতা ও মনোযোগসমস্যা থাকার কারণে অ্যাসপার্জার্স শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্বিগ্নতা দেখা দিতে পারে। নিয়মনীতি, বিধি রুটিন ইত্যিাদি মেনে চলতে তারা পছন্দ করে। নিয়মের হেরফের ঘটলে তারা মানসিক টানাপোড়েনে পড়ে যায়।

অটিজম আছে এমন শিশুদের কিছু আচরণ

- চোখে চোখ না রাখা বা কম রাখা
- ডাকলে সাড়া না দেয়া
- বিকাশজনিত দক্ষতার মধ্যে অসামঞ্জস্যতা
- প্রাত্যহিক রুটিন পরিবর্তনে বাধা দান
- অতিরিক্ত চঞ্চলতা বা উত্তেজনা
- আবেগ প্রকাশে অসুবিধা
- অস্বাভাবিক শারীরিক অঙ্গভঙ্গি
- সত্যিকার বিপদে ভয় না পাওয়া
- অসংগতিপূর্ণ হাসিকান্না
- কোনো কিছুর প্রতি অস্বাভাবিক আকর্ষণ
- খাওয়া, ঘুম, মলমূত্র ত্যাগে অস্বাভাবিকতা
- নিজের বা অপরের জন্য বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর ব্যবহার
- অখাদ্য খাওয়া

অটিজমের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

অটিজমের বৈশিষ্ট্য ও মাত্রা প্রতিটি শিশুর ক্ষেত্রে আলাদা। মূল শনাক্তকারীর বৈশিষ্ট্য হলো- সামাজিক মেলামেশা, যোগাযোগ ও পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ। এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই অটিজমের মূল লক্ষণ। অটিজমের জন্য ইন্দ্রিয়ানুভূতি, অপরের সাথে যোগাযোগ করার কৌশল এবং সামাজিক মিথক্রিয়া প্রক্রিয়াগুলো বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে তাদের মধ্যে একই ধরনের আচরণ অথবা অসামঞ্জস্য আচরণের উৎসাহ দেখা যায়। এটা জানা জরুরী যে, অটিজমের লক্ষণগুলো স্নায়ুবিক কারণে হয় এবং একজনের সাথে আরেকজনের হুবহু মিল নেই।

ক) সামাজিক লক্ষণসমূহ

অটিজম আছে এমন শিশুদের অধিকাংশের মধ্যেই অন্যের সাথে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার গুরুতর সমস্যা দেখা যায়। জীবনের প্রথম কয়েক মাসে তারা অন্যের চোখে চোখ রেখে তাকায় না। তারা অন্যের প্রতি নির্লিপ্ত থাকে এবং একা থাকতে পছন্দ করে। তারা অন্যের মনোযোগ পেতে চায়না এবং জড়িয়ে ধরা পছন্দ করে না। তারা অন্যের রাগ বা আদরের প্রতি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখায় না।

অটিস্টিক শিশুদের কোন কিছু শিখতে অনেক সময় লাগে। তারা কারোর সাধারণ ইশারা, ইঙ্গিত বোঝে না। যেমন- মুচকিহাসি, মৌখিক অভিব্যক্তি তাদের কাছে কম অর্থবহ বিষয়। অটিস্টিক শিশুদের উত্তেজিত ও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠার প্রবণতা সমাজের সাথে খাপ খাওয়াতে বা সম্পর্ক তৈরিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যখন তারা বাইরের পরিবেশে যায় তখন তারা রেগে যায় বা হতাশ হয়, আবার তাদের কেউ কেউ নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এ সময় তারা জিনিসপত্র ভাংচুর করতে পারে, অন্যকে বা আবার নিজের শরীরেও আঘাত করতে পারে।

খ) যোগাযোগ সমস্যা

যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যমে হলো ভাষা। ভাষাগত অসুবিধার কারণে অটিস্টিক শিশুদের অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সমস্যা দেখা দেয়। কিছু অটিস্টিক শিশু কখনই কথা বলতে শেখে না। কোনো কোনো শিশু জন্মের কয়েকমাস পরে ব্যবলিং বা আধো আধো কথা বলতে শেখে কিন্তু কিছুদিন পর সেটাও বন্ধ হয়ে যায়। আবার কারো ক্ষেত্রে ভাষা শিখতে ৫-৯ বছর সময় লেগে যায়। তবে অটিস্টিক শিশুরা ছবি, ইশারা, ভাষা বা স্পর্শের সাহায্যে অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা শিখতে পারে। অটিজম আছে এমন অনেক শিশুর ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছুটা অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। তারা গুছিয়ে শব্দ বিন্যাস করে সঠিক বাক্য গঠন করতে পারে না। কেউ কেউ একটি শব্দ দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করে। কেউ কেউ যে শব্দটি শোনে সেটিই বার বার বলতে থাকে। কোনো কোনো অটিস্টিক শিশু কোনো একটি নির্দিষ্ট শব্দ বলে এবং টিয়া পাখির মত শব্দটি বার বার বলতে থাকে, যাকে ইকোলালিয়া বলে।

গ) পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ

অটিজম শিশুরা শারীরিকভাবে স্বাভাবিক এবং সবারই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ভালো। কিন্তু অস্বাভাবিক পুনরাবৃত্তি মূলক আচরণ তাদেরকে অন্য শিশুদের থেকে আলাদা করে রাখে। এই অস্বাভাবিক পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ তীব্র থেকে মৃদু হতে পারে। তাদের অনেকেই বার বার হাত নাড়ায়, পায়ের সামনের অংশের উপর ভর দিয়ে হাঁটে, অথবা কোনো বিশেষ ভঙ্গিতে দীর্ঘসময় স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। তারা অনেকসময় খেলনা গাড়ি বা ট্রেন নিয়ে খেলা করার বদলে এগুলোকে এক লাইনে সাজায়। অসাবধানতাবশত কেউ যদি এই সাজানো গাড়ি বা ট্রেন নাড়িয়ে ফেলে তবে তারা খুব হতাশ বা বিচলিত হয়ে পড়ে।

অটিস্টিক শিশুরা চায় তাদের চারপাশে যেমন আছে তেমনই থাক। তারা কোনো পরিবর্তন পছন্দ করে না। দৈনন্দিন রুটিন অনুযায়ী খাওয়া, গোসল করা, একই রাস্তায় নির্দিস্ট সময়ে স্কুলে যাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে সামান্যতম হেরফের হলে তারা বিরক্ত বোধ করে। পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ তাদের আচরণকে আগে থেকেই যুক্ত করে রাখে। যেমন– দীর্ঘ সময় ধরে ফ্যান ঘোরানো ও আলোর দিকে তাকিয়ে থাকা। তাদের কারো কারোর মধ্যে দারুণ আগ্রহ দেখা যায় সংখ্যা, চিহ্ন বা বিজ্ঞান বিষয়ে।

অটিজম শিশুদের কিছু সবল দিক

- সুনিপুণভাবে দেখার ক্ষমতা
- সুশৃংখল নিয়মনীতির ধারণা, ধারাবাহিকতা, প্যাটার্ন ইত্যাদি বিষয়গুলো বুঝতে ও মনে রাখতে পারে।
- বিস্তারিত মুখস্থ করার মতো বিষয় (গণিত, ট্রেনের সময়সূচি, খেলার স্কোর) মনে রাখতে পারে।
- দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতি
- কম্পিউটার ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা
- সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রের প্রতি আগ্রহ
- বিশেষ পছন্দনীয় বিষয়ের প্রতি মনোযোগ
- শৈল্পিক দক্ষতা
- অল্পবয়সে লিখিত ভাষা পড়তে পারা (বুঝতে পারুক বা না পারুক)
- বানান মনে রাখা
- সততা
- সমস্যা সমাধানে দক্ষতা

অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার-এর কারণ কী?

অটিজম কেন হয় তা, সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ এখন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে অটিজম বিষয়ে সচেতনতা ও জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির সাথে সাথে কারণ অনুসন্ধানের কাজটিও বেড়ে চলেছে।

বিভিন্ন কারণে অটিজম হয়ে থাকে এ বিষয়টি বর্তমানে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন পর্যায়ে অটিজমের যে জটিল লক্ষণ দেখা যায় তা থেকে বলা যায় যে, একাধিক কারণে অটিজম হতে পারে। জন্মপূর্ব, জন্মকালীন ও জন্মপরবর্তী যে কোনো সময়ে জেনেটিক (বংশগত) এবং ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশের প্রভাবে অটিজম হতে পারে। কোনো শিশুর মধ্যে অটিজমের কিছু লক্ষণ থাকলেই অটিজম আছে এমন সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না। কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকই বলতে পারবেন শিশুটির অটিজম আছে কিনা। শিশু বিশেষজ্ঞ, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, শিশু স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানী কিংবা অটিজম-এ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চিকিৎসকরাই অটিজম নির্ণয় করবেন।

অটিস্টিক শিশুদের শিল্প ও মূলধারার শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তকরণ

অটিস্টিক শিশুদের শিক্ষাদানের কার্যক্রম ঠিক করার জন্য বিশেষজ্ঞ পেশাজীবীদের প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর আচরণ, বিকাশ, সামাজিক ও একাডেমিক প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে সপ্তাহে প্রয়োজনীয় কাজের জন্য কত সময় ব্যয় করতে হবে তা নির্ধারণ করা হয়। কেবলমাত্র একটি পদ্ধতির মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষাদান সম্ভব নয়, একসাথে বা ক্রমান্বয়ে একাধিক পদ্ধতির প্রয়োগ করতে হবে। প্রায়োগিক আচরণ বিশ্লেষণ (Applied behaviour analysis) নীতিমালার উপর ভিত্তি করে অনেকগুলো শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

অটিস্টিক শিক্ষার্থীর শিক্ষায় সহায়তা প্রদান ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে হবে। শিশুর সবল দিক ও চাহিদার সহায়তার জন্য প্রস্তুতি নিতে অভিভাবকসহ সকল সদস্যের মধ্যে যোগাযোগ থাকা জরুরী এবং ইতিবাচক সফলতার জন্য কার্যকর কৌশল নির্ধারণ, সমন্বয়, ও সহযোগিতার প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের শুধু শ্রেণিকক্ষে বসিয়ে দেয়াই নয়, তাদের মূলধারার কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরী। অটিস্টিক শিশুদের সফলতার জন্য তাদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। সেজন্য ছোট ছোট সাফল্যও উল্লেখ করতে হবে। অটিজমের বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি একজন শিক্ষার্থীর গুণাবলি জানা থাকলে উপযুক্ত পরিকল্পনা করতে সুবিধা হয়।

শ্রেণিকক্ষে বা সমাজে অটিস্টিক বন্ধুদের কীভাবে সহায়তা প্রদান করা যায়

অটিস্টিক শিশুদের সহপাঠীদের 'সহযোগী বন্ধু' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। সহপাঠীদের মধ্যে বন্ধুত্বের ধারণা এবং লক্ষ্য অর্জনে একতাবদ্ধতার পরিবেশ গড়ে তোলা প্রয়োজন যাতে অটিস্টিক শিশুরা যথাযথ সহায়তা, সম্মান নিয়ে বেড়ে উঠতে পারে। অটিস্টিক শিশুদের প্রতি সংবেদনশীলতা ও ইতিবাচক মানসিকতায় প্রায় সবাই আমরা উপকৃত হবো কেননা এদের মধ্যে কেউ আমাদের ভাই বোন, প্রতিবেশী বা আত্মীয়। অটিজম সংক্রান্ত শিক্ষা বা সংবেদনশীলতার প্রশিক্ষণ কোনো নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীর উপর ভিত্তি করে হবে না, তা সার্বিকভাবে হতে হবে।

শ্রেণিকক্ষে নির্দেশনা বুঝতে বা মিথস্ক্রিয়া বাড়াতে সহপাঠীদের করণীয়–

১। এক শ্রেণি কক্ষ থেকে অন্য শ্রেণি কক্ষে নিয়ে যাওয়া
২। শ্রেণিকক্ষের কাজ ও শিক্ষাসংক্রান্ত উপকরণ গুছিয়ে রাখা
৩। শ্রেণিকক্ষের জন্য নির্দিষ্ট রুটিন মেনে চলা
৪। সহপাঠীদের সাথে মেলা মেশার জন্য উৎসাহ প্রদান করা
৫। শ্রেণিতে পড়ানোর বিষয়টির সারমর্ম বলা ও মূল বিষয়টি পুনরায় বলা
৬। শ্রেণিকক্ষের আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান
৭। মৌখিকভাবে অথবা যোগাযোগ সহায়ক যন্ত্রের মাধ্যমে প্রদত্ত উত্তরসমূহ লিখিত রূপে প্রকাশে সাহায্য করা।
৮। হতাশ হলে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও উৎসাহ প্রদান করা
৯। অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য সর্বদা তাকে পুরস্কৃত করা
১০। শ্রেণিকক্ষের কাজ সঠিকভাবে করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা

সাধারণত সারাজীবন ধরে অটিজমের লক্ষণগুলো একজনের মধ্যে থাকতে পারে, তবে যথাযথ সাহায্য, নির্দেশনা ও উপযুক্ত শিক্ষা পেলে সময়ের সাথে কিছু কিছু লক্ষণের উন্নতি হয়। যাদের মাঝে অল্পমাত্রার সমস্যা থাকে তাদের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয় এবং তারা স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে। মাঝারি ও বেশি সমস্যাগ্রস্ত শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তারা ঠিকমত কথা বলতে পারে না এবং নিজের যত্নও নিতে পারে না। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করা গেলে এবং নিবিড় প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা পেলে অটিস্টিক শিশুরা নানাক্ষেত্রে সফলতা পেতে পারে।

অটিস্টিক শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য বাংলাদেশেও কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে উঠেছে। যেমন– প্রয়াস, অটিজম ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, সোয়াক, অটিস্টিক চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন ইত্যাদি। এ ছাড়া কিছু স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যারা অটিজম শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে কর্মরত রয়েছে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে ও উন্নতিতে অবদান রাখতে পারবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	
	অটিজমের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন
	১।
	২।
	৩।
	অটিস্টিক শিশুদের প্রধান ৫টি সবল দিক
	১।
	২।
	৩।
	৪।
	৫।

সারাংশ

অটিজমের বৈশিষ্ট্য ও মাত্রা শিশুভেদে ভিন্নতর। মূল শনাক্তকারী অটিজমের বৈশিষ্ট্য হলো তিনটি– ১। সামাজিক মেলামেশা, ২। যোগাযোগ ও ৩। পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ। এগুলোই অটিজমের মূল লক্ষণ হিসেবে পরিচিত।

অটিষ্টিক শিশুদের অধিকাংশের মধ্যেই সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার গুরুতর সমস্যা দেখা যায়। তারা অন্যের চোখে চোখ রেখে তাকায়না, অন্যের প্রতি নির্লিপ্ত থাকে এবং একা থাকতে পছন্দ করে। তারা অন্যের রাগ বা আদরের প্রতি কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায় না এবং কারো জড়িয়ে ধরা পছন্দ করে না।

ভাষাগত বিকাশের ক্ষেত্রে অটিস্টিক শিশুদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ভাষাগত অসুবিধার কারণে অটিস্টিক শিশুদের অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সমস্যা হয়। তবে অটিস্টিক শিশুরা ছবি, ইশারা, ভাষা বা স্পর্শের সাহায্যে অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা শিখতে পারে।

কিছু অটিস্টিক শিশু পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ করে। তারা একই কাজ বার বার করতে চায়। তাদের অনেকেই বার বার হাত নাড়ায়। তারা পায়ের সামনের অংশের উপর ভর দিয়ে হাঁটে এবং কোন এক বিশেষ ভঙ্গিতে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

এদের কিছু সবল দিকও আছে যেমন- সুনিপুণভাবে দেখার ক্ষমতা, সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রের প্রতি আগ্রহ, বানান মনে রাখা, বিস্তারিত ও মুখস্থ করার ক্ষমতা। অটিস্টিক শিশুদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করা আমাদের সবার কর্তব্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। অটিজমের মূল বৈশিষ্ট্য কয়টি?

ক) ৩ টি
খ) ৪ টি
গ) ৫ টি
ঘ) ২ টি

২। অটিজম আছে এমন শিশুদের সবল দিকগুলো কী?

i. সুনিপুণভাবে দেখার ক্ষমতা
ii. বানান মনে রাখা
iii. দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও iii
খ) iii
গ) i, ii
ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ড় মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। অটিজম কী?
২। অ্যাসপার্জার্স সিনড্রোম বলতে কী বোঝায়?
৩। পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ কাকে বলে?
৪। অটিজমের শিশুদের সাথে কী রকম আচরণ করা উচিত?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। অটিজমের একটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন?
২। একটি অটিজম শিশুর সবল দিকগুলো বর্ণনা করুন।
৩। শ্রেণিকক্ষে অটিস্টিক শিশুদের কীভাবে সাহায্য করা যায়?
৪। অটিস্টিক শিশুদের জন্য স্বেচ্ছাসেবীমূলক সংগঠনগুলোর নাম লিখুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১ :	১। ক	২। ঘ	৩। খ	৪। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২ :	১। খ	২। গ	৩। ক	৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩ :	১। খ	২। ক	৩। ঘ	৪। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৪ :	১। খ	২। ক	৩। গ	৪। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৫ :	১। খ	২। গ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৬ :	১। ক	২। ঘ		